দিগিন্দ্রচন্দ্রের নাটকে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা

অন্তরা চ্যাটার্জী

অধ্যাপিকা

বাংলা বিভাগ

বিংশ শতাব্দির প্রথম দশকে লর্ড কার্জন "বিভাজন ও শাসন" নীতি অনুসরণ করে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা কার্যকর করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে বাংলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তবে তাঁর এই সিদ্ধান্ত খুব একটা ভুল ছিল না। সেই কারণেই কার্জন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। ডঃ বিপানচন্দ্রের মতে, উনিশ শাতকের শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ সেই অর্থে ঘটেনি। ভারতে কমিউনাল ভাবনার উৎস ইংরেজদের মস্তিষ্ক প্রসূত। কার্জনের এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সমগ্র বাংলা জুড়ে। বঙ্গভঙ্গের বিরোধী মনোভাব ভারতবর্ষে ক্রমশ সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ নিতে থাকে। সমগ্র দেশ জুড়ে অহিংস ও সহিংস আন্দোলন পাশাপাশি বিস্তার লাভ করতে থাকে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের চল্লিশ বছর পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করে শাসনভার হস্তান্তরিত করা হল। "খন্ডিত ভারতবর্ষ দুভাগ হয়ে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান হল আর অবিভক্ত বাংলা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে হল পূর্ব পাকিস্থান ও পশ্চিমবঙ্গ"।১

দেশভাগ হয়ে যায় ধর্মের ভিত্তিতে। ১৯৪৬ সালে কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার এবং পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯৪৬ এর "The Great Calcutta Killing" সময় পর্বে মাত্র চারদিনে কলকাতা শ্মশানে পরিণত হয়।
শিশু-বৃদ্ধ-নর-নারী নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ নিহত হয় এবং ১৫ হাজারের মতো মানুষ আহত হয়। এর পাশাপাশি অগণিত আব্রু ভূলুন্ঠিত হয়। কলকাতার পর নোয়াখালীতেও দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। মহাত্মা গান্ধি অহিংস নীতির প্রচার করে ছুটে বেড়ালেন দাঙ্গার কেন্দ্রভূমিতে, বোঝাতে লাগলেন উন্মত্ত জনতাকে। যা তৎকালীন পত্র পত্রিকায় অনায়াসে ধরা দেয়।

১৯৪৬ এর দাঙ্গার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু জনতার ঢল নামে। ভারত ও পাকিস্তানের নেতাদের অবিবেচক ও অমানবিক সিদ্ধান্তে লক্ষ লক্ষ মানুষ সংকটের মুখে পড়ে। উদ্বাস্তু ও নিঃস্ব মানুষ পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটার মায়া কাটিয়ে প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে ছুটে আসে এপার বাংলায়। এই উদ্বাস্তু মানুষের স্রোত ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পর্যন্ত চলতে থাকে।

ছিন্নমূল এই মানুষ রূপান্তরিত হল উদ্বাস্তুতে। তাদের সংস্কৃতি ও সুস্থ জীবনবোধ বিসর্জিত হল, আত্মসম্মান ও আত্মপরিচয় লুণ্ঠিত হল। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা, মন্বন্তর ও মহামারি। দেশভাগের ভয়াবহতা, সাধারণ ভিটেমাটি ছাড়া জনমানুষের কথা প্রথমদিকের সাহিত্যে তেমনভাবে উঠে আসে নি। কিন্তু বাংলার কয়েকজন নাট্যকার এই বিপর্যস্ত জনজীবনকে তাঁদের নাটকের বিষয়বস্তু করেছিলেন। এই নাটকগুলি যথাক্রমে –দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা', তুলসী লাহিড়ির 'বাংলার মাটি', মন্মথ রায়ের 'ভাঙাগড়া', ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল', বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর', সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' ইত্যাদি। যদিও আমি আমার লেখনি 'বাস্তুভিটা', এই নাটকের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেশভাগের নির্মমতাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করবো।

দেশভাগের কারণে ছিন্নমূল নিঃস্ব, রিক্ত মানুষদের মনে যে দুর্দশার ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল, বাংলার নাট্যকারেরা সেই ক্ষতকে মানবিক দিক থেকে সারাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই নাটকগুলি শুধু দেশভাগের নির্মম চিত্রকে তুলে ধরেছে তা নয়, সমস্ত প্রতিকূলতাক পার হয়ে এক নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখায় এই নাটকগুলি।

আলোচনা প্রসঙ্গে যে নাটকটির কথা প্রথমেই উল্লেখ করা যায় সেটি হল দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭) নাটক। দেশভাগের পরপরই তিনি এই নাটকটি লেখেন। নাটকিতে সদ্য বিভক্ত পূর্ববঙ্গের হিন্দু পরিবারের সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছে। এই নাটকে দেশ ছেড়ে চলে আসা মানুষের কথা নেই। স্বয়ং নাট্যকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন-" বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়েও যারা বাস্তুভিটা ত্যাগ করেননি বাস্তুভিটা তাদের নাটক"। সেই কারণেই নাট্যকার উৎসর্গপত্রে লিখেছেন-"হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন সেই শহিদবৃন্দের স্মরণে উৎসর্গীকৃত"। আসলে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি বোধ অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যেই নাট্যকার এই নাটকটি লেখেন।

১৯৪৬ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে পরেই দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে খণ্ডিত হয়েছিল এই দেশ। হিন্দু মুসলমান সবাই যে এই দাঙ্গায় মেতে উঠেছিল তা কিন্তু নয়। দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস করলেও তাদের মনের মিল হয় নি। সামাজিক মর্যাদায় হিন্দুরা বেশি প্রাধান্য লাভ করে। মুসলমানদের প্রতি তাদের উপেক্ষাও ছিল। ফলে হিন্দুর সামাজিক প্রাধান্য, মুসলমানদের প্রতি অনাদর, অবহেলা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সংঘর্ষের আবর্ত তৈরি করে। এটা ছিল বাস্তব সত্যের একটা দিক। এসমস্ত কারণেই দেশভাগের পর সংখ্যা লঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গের সংখ্যা

গরিষ্ঠ অংশের সকল মানুষ যে সমভাবাপন্ন তা কিন্তু নয়। মুসলমানদের একটা বড় অংশ হিন্দুদের রক্ষা করে। নাটকের সেই সম্প্রীতির প্রসঙ্গ তুলে ধরাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য।

'বাস্তুভিটা' নাটকের কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র মহেন্দ্র মাষ্টার। মহেন্দ্র অধিকারী গ্রাম্য পাঠশালার একজন সৎ শিক্ষক। তিনি হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের ওপর ছিলেন গভীর আস্থাশীল। সেই কারণে দেশভাগের পরেও নিজের পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাই অনায়াসে বলতে পারেন-"পাকিস্থান হোক গোরস্থান হোক এখানেই আমাদের থাকতে হবে"।-কিন্তু পরিস্থিতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বিচলিত হতে বাধ্য হন। এখানে নাট্যকার দেখিয়েছেন শচীন, সোনা মোল্লার ছেলেরা কিংবা ইয়াসিন মিঞার মতো লোকেরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ায়। মহেন্দ্রমাস্টারের স্ত্রী মানদা যেন চিরন্তন নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ, তাই শচীন যখন শহর থেকে গ্রামে আসে বাস্তুভিটা বিক্রির জন্য তখন মানদা জানা সত্ত্বেও শচীনের কাছে ছুটে যায় কলকাতায়ে আশ্রয়ের উদ্দ্যেশে। শচীন নানা চেষ্টা করেও মহেন্দ্রমাস্টার ও আমীন মুন্সীর বন্ধুত্বে ফাটল ধরাতে পারে না। এমনকি দেশত্যাগে উদ্বুদ্ধ করতেও পারে না। কিন্তু স্থানীয় লিগ নেতা সোনা মোল্লা দ্বারা অপদস্ত হয়ে তিনি দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। সোনা মোল্লা যে অমানুষ তা কিন্তু নয়, তবুও হিন্দুদের বিপদের সময় সে এগিয়ে আসে না। এরই সুযোগ নেয় প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়াসিন মিঞা। সে দাঙ্গার আবহ তৈরি করতে থাকে এবং পাশাপাশি জনগণকে লুটপাঠের সিদ্ধান্ত নেয়। ইয়াসিন মিঞার এজাতীয় সিদ্ধান্তে সোনা মোল্লা হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে থাকে, বিশেষ করে মহেন্দ্র মাষ্টারকে এবং মহেন্দ্র মাস্টারও দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে।

সোনা মোল্লার চারিত্রিক পরিবর্তন ইয়াসিন মিঞার সঙ্গে ক্ষমতার লড়াইয়ের কারণে। সোনা মোল্লা জানতেন সাম্প্রদায়িকতা বন্ধ না করলে মুসলমানদের সহায়তায় ইয়াসিন মিঞা জনসমর্থন লাভ করবে।সেই কারণে সোনা মোল্লা হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির কথা বললেন। নাট্যকারের আদর্শ চরিত্র হিসাবে উল্লেখ করা যায় আমীন মুন্সী চরিত্রকে। তিনি মনে করেন –"পাকিস্থান না ফাকিস্থান। এতদিন যাঁরা উজীরী করেছেন তারাই তো পাকিস্থানের মালিক হবেন গরীবের তাতে কী?" এই বাস্তব সত্যটিকে তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। দাঙ্গা রোধ করতে গিয়ে তিনি যখন রক্তাক্ত হন তখনও বলতে থাকেন-ভুলের মাশুল দিতেই হবে। তবে এই বাস্তবজ্ঞানযুক্ত চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও আমীন চরিত্রটি বাস্তবের মাটিতে নেমে আসতে পারেনি। তবে কেন্দ্রিয় চরিত্র মহেন্দ্র মাস্টার বাস্তবতার ধূলামাটির স্পর্শে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

নাটকে শেষের দিকে দেখা যায় মহেন্দ্র মাস্টার গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে শুনে সোনা মোল্লা বাস্তুভিটা ত্যাগ না করার অনুরোধ নিয়ে ছুটে আসে। একদা তিনি সোনার কথা বিশ্বাস করলেও শেষ পর্যন্ত আর বিশ্বাস করতে পারেন না। কারণ সোনার আসল চরিত্র তার কাছে সহজে উঠে এসেছে। কিন্তু আহত বন্ধু আমীন মুন্সী যখন জিজ্ঞাসা করেন- "মাস্টারদা, তুমি নাকি গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছ?" তখন দ্বিধান্বিত হয়ে আবেগে আমীনকে জড়িয়ে ধরে বলেন- তাকে ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না।

নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র এই নাটকে গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিতের চিত্রায়ণের মাধ্যমে দেশ বিভাগের নির্মমতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এই নাটক যেন চিরন্তন ঐতিহাসিক সত্যকেই তুলে ধরেছে যে, যুগে যুগে ধর্ম নিয়ে হানাহানি করলেও মানবিকতার জয় হয় সর্বত্র। হিন্দু মুসলমানের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবেদন রেখেছেন নাট্যকার তার 'বাস্তুভিটা' নাটকে।

দিগিন্দ্রচন্দ্রের লেখা 'অপচয়' এবং 'এপিঠ- ওপিঠ' দেশভাগের পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যার করুণ চিত্র। এই দুটিই একাঙ্ক নাটক। 'অপচয়' নাটকটিতে নাট্যকার উদ্বাস্তু মেয়ে সুশীলার বিয়ে সংক্রান্ত সংস্কারের সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছে এবং 'এপিঠ- ওপিঠ' নাটকে উদ্বাস্তু পরিবারের বাস্তু সমস্যা মূল বিষয় হিসাবে দেখা দিয়েছে। দুটি নাটকই বিষয়ের চিত্রায়নে অন্যনতার দাবি রাখে।

সাহিত্যিকরা জীবনের ছবি আঁকেন। তবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা তাদের থেকেই যায়। সমাজের সমস্যা, তার সমাধানের পথে শিল্পীরা অগ্রণী ভূমিকা নেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারি, দাঙ্গা, দেশভাগের করাল গ্রাসে দেশ যখন জর্জরিত তখন শিল্পীরা তাদের লেখনিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করলেন। নাট্যকারেরা দেশভাগ ও দেশভাগের যন্ত্রণার কথা স্মরণ করে দুই বাংলার ঐক্যের কথাই বলেছিলেন। তাঁদের লেখা নাটকগুলি জীবনের সমস্যার দলিল হয়ে উঠল। সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমে শোষণের অবসানের পথনির্দেশ করে তারা মুক্তির নিশানা খুঁজে নিতে সাহায্য করেছিল। সেই নাট্যকারদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস,১৯৮২, কলকাতা

২। অমলেন্দু দে, প্রসঙ্গঃ অনুপ্রবেশ,১৯৭৬, কলকাতা

৩। সুরমা ঘটক ,ঋত্বিক, ১৪০২, কলকাতা

৪। সুব্রত রুদ্র (সম্পাদিত), সেই ঋত্বিক, ১৯৮৫, কলকাতা

৫। নাট্যদর্পণ, ১ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মে ১৯৭৫, কলকাতা

৬। গন্ধর্ব (বিজন ভট্টাচার্য সংখ্যা),১৩৮৪, কলকাতা

৭। দেবব্রত বিশ্বাস, বাংলা নাটকে প্রতিবাদের ভাষা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, কলকাতা